ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ঢাকা শহরে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯

ঢাকা শহরে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক-গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি*

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
মো. জুলকারনাইন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি*
মো. মোস্তফা কামাল, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি*

কৃতজ্ঞতা
মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, কীটতত্ত্ববিদ, জনস্বাস্থ্য গবেষক, বিশেষজ্ঞ যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মূল্যবান মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরামের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা ড. সুমাইয়া খায়ের, গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, এবং অন্যান্য সহকর্মী যারা বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা ও মূল্যবান মতামত দিয়ে গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ১

অধ্যায় এক: ভূমিকা ২

১.১ গবেষণা প্রেক্ষাপট ২

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ৩

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ৪

১.৪ গবেষণার পরিধি ৪

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি ৪

১.৬ গবেষণা সময়কাল ৪

অধ্যায় দুই: গবেষণার ফলাফল ৫

২.১ মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন ৫

২.১.১ ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ৫

২.১.২ সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা (সিডিসি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ৬

২.১.৩ উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৬

২.১.৪ রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) ৭

২.১.৫ মশক নিবারণ দপ্তর ৭

২.২ এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত উদ্যোগ ৭

২.৩ এডিস মশা জরিপ ও ডেঙ্গু রোগের পূর্বাভাস, কীটনাশকের কার্যকরতা নিয়ে সতর্কতা এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ ৭

২.৩.১ এডিস মশা জরিপ ও ডেঙ্গু রোগের পূর্বাভাস ৭

২.৩.২ কীটনাশকের কার্যকরতা নিয়ে গবেষণা ও সতর্কতা ৮

২.৩.৩ আগাম পূর্বাভাস এবং গবেষণাকে গুরুত্ব না দেওয়া ৮

২.৩.৪ ডেঙ্গুর প্রকৃত চিত্র চিহ্নিত করায় ঘাটতি ৯

২.৪ মশা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ১০

২.৪.১ জাতীয় নীতি, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা না থাকা ১০

২.৪.২ এলাকাভিত্তিক বা আঞ্চলিক পরিকল্পনা না থাকা ১০

২.৪.৩ এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সকল পদ্ধতির সমন্বয় না করা ১০

২.৪.৪ উপযুক্ত কীটনাশক নির্ধারণ না করা ১১

২.৪.৫ পণ্যের চাহিদা নিরূপন বা প্রাক্কলন ১১

২.৫ কীটনাশক ও উপকরণ ক্রয় ১২

২.৫.১ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নে অনিয়ম ১২

২.৫.২ দরপত্রের দলিল প্রস্তুতিতে অনিয়ম ১২

২.৫.৩ দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগে অনিয়ম ১২

২.৫.৪ দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতি ১৩

২.৫.৫ দরপত্রের দলিল প্রক্রিয়াকরণ ও কার্যাদেশ প্রদানে অনিয়ম ১৩

২.৬ কীটনাশকের মান নিয়ন্ত্রণ ১৪

২.৬.১ কীটনাশকের মাঠ পর্যায়ের কার্যকরতা পরীক্ষায় সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম ১৪

২.৬.২ কীটনাশকের কার্যকরতা পরীক্ষার (Efficacy test) সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম-দুর্নীতি ১৪

২.৬.৩ কীটনাশকের নিবন্ধনে অনিয়ম ও দুর্নীতি ১৪

২.৭ মাঠ পর্যায়ের মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ১৫

২.৭.১ অপ্রয়োজনীয় ও লোক দেখানো ব্যবস্থা গ্রহণ ১৫

২.৭.২ মাঠ পর্যায়ের মশা নিধন কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতি ১৫

২.৭.৩ দায়িত্ব পালনে অবহেলা ১৫

২.৭.৪ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা: জনবল ঘাটতি ও প্রশিক্ষণের অভাব ১৫

২.৭.৫ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা: অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি ঘাটতি ১৬

২.৮ মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বয় ১৭
২.৯ পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণের সুযোগের ঘাটতি ১৭
২.১০ মশা নিয়ন্ত্রণে সুশাসনের ঘাটতি ও ফলাফল ১৮
অধ্যায় তিন: উপসংহার **১৯**
৩.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ ১৯
৩.২ সুপারিশ ১৯

মুখবন্ধ

এডিস মশাবাহিত সংক্রামক রোগ ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও জিকা বিগত কয়েক দশক জুড়ে সারা বিশ্বের বিভিন্ন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ বর্তমানে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। বাংলাদেশেও গত দুই দশকে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া একটি প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়ার কারণে বাংলাদেশে এই রোগের ঝুঁকি আরও বেশি। বাংলাদেশের সংবিধানে জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলে গণ্য করার কথা বলা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের প্রেক্ষিতেও সরকার কর্তৃক সংক্রামক রোগের প্রতিরোধে বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যার মধ্যে স্বাস্থ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। বাংলাদেশে বিশেষত ঢাকায় ২০০০ সাল থেকে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব হলেও এবং বিগত কয়েক বছরের অন্যতম রোগের বোঝা হওয়া সত্ত্বেও ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম কতটুকু কার্যকর হচ্ছে এবং কার্যকর না হলে কেন হচ্ছে না, এক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতিগুলো কী কী এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় কী তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট গবেষণার প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে এবং স্বাস্থ্য খাতে টিআইবি'র গবেষণা ভিত্তিক অধিপরামর্শ কার্যক্রমে প্রাধান্যের ধারাবাহিকতায় ডেঙ্গুকে একটি জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

মশা নিয়ন্ত্রণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, কীটতত্ত্ববিদ, জনস্বাস্থ্য গবেষক ও বিশেষজ্ঞ যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক মো. জুলকারনাইন ও মো. মোস্তফা কামাল। অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। গবেষণার তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবেদন সম্পাদনা ও পরিমার্জন করেছেন সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম। এছাড়া প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকগণ এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ এবং এই কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। পাঠকের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

অধ্যায় এক
ভূমিকা

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট

ডেঙ্গু জ্বর একটি রোগ-সংক্রামক কীটবাহিত ভাইরাসজনিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ (Tropical Disease)। *এডিস ইজিপটাই* ও *এডিস এলবোপিকটাস* প্রজাতির মশার মাধ্যমে এর সংক্রমণ হয়ে থাকে। ডেঙ্গু ছাড়াও এই মশা চিকুনগুনিয়া ও জিকা ভাইরাস সংক্রমণ করে থাকে। ১৯৭০ এর দশকের পূর্বে মাত্র ৯টি দেশের ডেঙ্গু মহামারীর অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তবে গত পাঁচ দশকে খুব দ্রুত হারে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ বর্তমানে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।[১] ডেঙ্গুতে আক্রান্তের প্রকৃত সংখ্যা জানা না গেলেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রাক্কলিত তথ্যমতে প্রতি বছরে প্রায় ১০০টি দেশে ৫০-১০০ মিলিয়ন (৫-১০ কোটি) মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয় এবং প্রায় ২০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তিসহ অন্যান্য চিকিৎসার প্রাক্কলিত খরচ প্রায় ৪৩,৫০০ টাকা থেকে ১১৮,০০০ টাকা।[২]

চিত্র ১: বাংলাদেশে ডেঙ্গু প্রবণতা (২০০০-২০১৯)

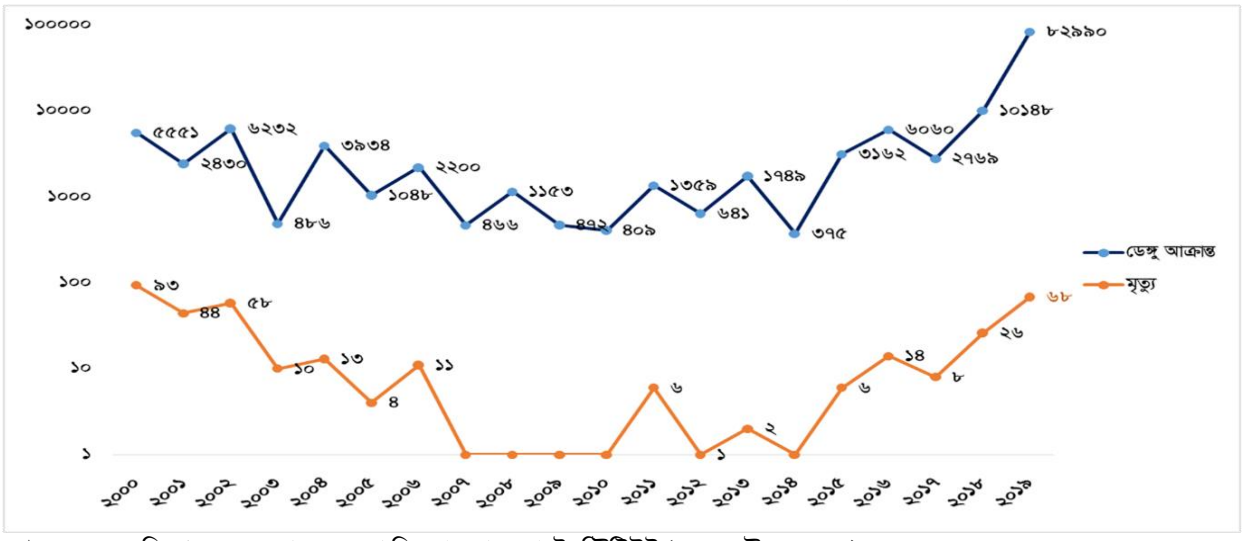

তথ্যসূত্র: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯)।

বাংলাদেশে ১৯৬৪ সাল থেকে ডেঙ্গু জ্বরের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। তবে প্রথম ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব হয় ২০০০ সালে। এ বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা ৫,৫৫১ জন এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৯৩।[৩] বাংলাদেশে ডেঙ্গু একটি অন্যতম জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশে ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের সময়কাল সাধারণত বর্ষা মৌসুম (মে-আগস্ট) এবং বর্ষা পরবর্তী মৌসুম (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) হলেও ২০১৪ সাল হতে এর ধরন পরিবর্তিত হয়ে প্রাক বর্ষা মৌসুমেও (জানুয়ারি-এপ্রিল) ডেঙ্গু আক্রান্ত হচ্ছে। ২০১৫-১৭ সালে প্রাক বর্ষা মৌসুমে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা এর পূর্বের ১৪ বছরে আক্রান্তের সংখ্যার চেয়ে সাত গুণ বেশি।[৪] বাংলাদেশে এডিস মশার মাধ্যমে ২০১৭ সালে চিকুনগুনিয়ারও ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এবছর মোট ১৩,৮১৪ জন চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত হয়।[৫]

---

[১] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিস্তারিত দেখুন https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue)

[২] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, 'ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের বৈশ্বিক কৌশল ২০১২-২০, বিস্তারিত দেখুন,
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75303/9789241504034_eng.pdf

[৩](Dhar Chowdhury, Parnali & Haque, Emdad & Driedger, S. (2015). Dengue Disease Risk Mental Models in the City of Dhaka, Bangladesh: Juxtapositions and Gaps Between the Public and Experts. Risk analysis : an official publication of the Society for Risk Analysis. 36. 10.1111/risa.12501, বিস্তারিত দেখুন:
https://www.researchgate.net/publication/282047789

[৪] Pulak Mutsuddy, Sanya Tahmina Jhora, Abul Khair Mohammad Shamsuzzaman, S. M. Golam Kaisar, and Md Nasir Ahmed Khan, "Dengue Situation in Bangladesh: An Epidemiological Shift in terms of Morbidity and Mortality," Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology, vol. 2019, Article ID 3516284, 12 pages, 2019. https://doi.org/10.1155/2019/3516284.

[৫] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ন্যাশনাল হেলথ বুলেটিন ২০১৭, বিস্তারিত জানতে দেখুন:
http://www.dghs.gov.bd/images/docs/Publicaations/HealthBulletin2017Final13_01_2018.pdf

সারণি ১: সরকারি হিসাব অনুযায়ী মাসভিত্তিক ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা (২০০৮- সেপ্টেম্বর ২০১৯)

মাস	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	মোট
২০০৮	০	০	০	০	০	০	১৬০	৪৭৩	৩৩৪	১৮৪	০	০	১১৫১
২০০৯	০	০	০	০	১	০	৪	১২৫	১৮৮	১৫৪	০	০	৪৭২
২০১০	০	০	০	০	০	০	৬১	১৮৩	১২০	৪৫	০	০	৪০৯
২০১১	০	০	০	০	০	৬১	২৫৫	৬৯১	১৯৩	১১৪	৩৬	৯	১৩৫৯
২০১২	০	০	০	০	০	১০	১২৯	১২২	২৪৬	১০৭	২৭	০	৬৪১
২০১৩	৬	৭	৩	৩	১২	৫০	১৭২	৩৩৯	৩৮৫	৫০১	২১৮	৫৩	১৭৪৯
২০১৪	১৫	৭	২	০	৮	৯	৮২	৮০	৭৬	৬৩	২২	১১	৩৭৫
২০১৫	০	০	২	৬	১০	২৮	১৭১	৭৬৫	৯৬৫	৮৬৯	২৭১	৭৫	৩১৬২
২০১৬	১৩	৩	১৭	৩৮	৭০	২৫৪	৯২৬	১৪৫১	১৫৪৪	১০৭৭	৫২২	১৪৫	৬০৬০
২০১৭	৯২	৫৮	৩৬	৭৩	১৩৪	২৬৭	২৮৬	৩৪৬	৪৩০	৫১২	৪০৯	১২৬	২৭৬৯
২০১৮	২৬	৭	১৯	২৯	৫২	২৯৫	৯৪৬	১৭৯৬	৩০৮৭	২৪০৬	১১৯২	২৯৩	১০১৪৮
২০১৯	৩৮	১৮	১৭	৫৮	১৯৩	১৮৮৪	১৬২৫৩	৫২৬৩৬	১১৮৩৯	-	-	-	৮২৯৯০

তথ্যসূত্র: রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯)।

২০১৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব শুরু হয় এবং জুন মাস থেকে এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের তথ্যমতে জুলাই মাসে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ১৬,২৫৩ জন। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা ৮২,৯৯০ জন এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৬৮ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এই সংখ্যা শুধুমাত্র হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সংখ্যা বিবেচনা করে; ঢাকায় সকল সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যে সব মিলিয়ে মাত্র ৪১টি হাসপাতালের তথ্য এবং ৬৪টি জেলার সিভিল সার্জন কর্তৃক পাঠানো তথ্য সংকলন করা হয়। যেহেতু ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা অল্প কয়েকটি হাসপাতাল হতে সংগ্রহ করা হয়েছে সেই হিসাবে আক্রান্তের সংখ্যা কয়েক লক্ষ বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন। সরকারি হিসাবে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে ঢাকায় ৫৪.৯ শতাংশ এবং ঢাকার বাইরের হাসপাতালে ৪৫.১ শতাংশ। রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) এর কাছে ডেঙ্গু সন্দেহে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ২০৩ জনের মৃত্যুর তথ্য পাঠানো হয়, এর মধ্যে আইইডিসিআর ১১৬ জনের মৃত্যুর তথ্য বিশ্লেষণ করে ৬৮ জনের মৃত্যু ডেঙ্গুজনিত বলে নিশ্চিত হয়।[৬] যদিও বেসরকারি তথ্যমতে মৃতের সংখ্যা ২২৩ জন (১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত)।[৭]

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৩ এ বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, এইডসসহ অবহেলিত সকল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগের (Tropical Disease) মহামারী নির্মূল করা এবং হেপাটাইটিস, পানিবাহিত ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জারি রাখতে হবে।[৮] এছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের বৈশ্বিক কৌশল ২০১২-২০' এর লক্ষ্যমাত্রায় ২০১৫ সালের মধ্যে সদস্য দেশগুলোর ডেঙ্গু রোগের প্রকৃত বোঝা প্রাক্কলন (True disease burden) করা, ২০২০ সালের মধ্যে ডেঙ্গু মৃত্যুর হার ৫০ শতাংশ এবং রোগের হার ২৫ শতাংশ হ্রাস করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।[৯] এই লক্ষমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বাংলাদেশে তার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। যে কোনো প্রাদুর্ভাবে সাময়িকভাবে কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও পরবর্তীতে তা আর চলমান রাখা হয় না।

[৬] হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ২০১৯ সালের ডেঙ্গু রোগী ও সন্দেহজনক ডেঙ্গু রোগীর সর্বশেষ তথ্য, http://www.dghs.gov.bd/images/docs/Notice/2019/dengue/Dengue_20190918.pdf হতে ১৮.০৯.২০১৯ তারিখে সংগৃহীত

[৭] দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ জানুয়ারি ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1614778

[৮] টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), বিস্তারতি দেখুন: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3

[৯] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের বৈশ্বিক কৌশল ২০১২-২০, বিস্তারিত জানতে দেখুন: https://www.who.int/denguecontrol/9789241504034/en/

২০১৯ সালে বাংলাদেশে জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হওয়া ডেঙ্গুর ব্যাপকতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের একাংশ কর্তৃক প্রথম দিকে এই ব্যাপকতাকে অস্বীকার, যথাসময়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণে ঘাটতি, মশা নিয়ন্ত্রণে অব্যবস্থাপনা, কীটনাশক ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি, জরুরি পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে ডেঙ্গু পরীক্ষার কিট (এনএস১ টেস্ট কিট), মশক নিধন যন্ত্র, জনস্বাস্থ্য কীটনাশক, রোগ-নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সিন্ডিকেটের সক্রিয় হওয়ার বিষয়গুলো সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। একইভাবে ২০১৭ সালে চিকুনগুনিয়া প্রাদুর্ভাবের সময়ও প্রায় একই ধরনের অভিযোগ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশে বিশেষত ঢাকায় ২০০০ সাল থেকে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব হলেও এবং বিগত কয়েক বছরের অন্যতম রোগের বোঝা (disease burden) হওয়া সত্ত্বেও ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম কতটুকু কার্যকর হচ্ছে এবং কার্যকর না হলে কেন হচ্ছে না তা নিয়ে অনুসন্ধানী গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টিআইবি'র কার্যক্রমে স্বাস্থ্য একটি অন্যতম খাত, স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন গবেষণার ধারাবাহিকতায় ডেঙ্গুকে একটি জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ঢাকা শহরে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা এবং এ সংশ্লিষ্ট সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের যে বিভিন্ন ধাপগুলো রয়েছে তা পর্যালোচনা করা, এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও কারণ চিহ্নিত করা, এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে যে সকল অংশীজন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তাদের মধ্যেকার সমন্বয় পর্যালোচনা করা এবং এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুপারিশ প্রদান করা।

১.৪ গবেষণার পরিধি

ঢাকা শহরের মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের বিভিন্ন ধাপ এবং ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনসহ এ সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং তাদের মধ্যেকার সমন্বয় কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় যেসব কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- এডিস মশা জরিপ, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ, ডেঙ্গু রোগের পূর্বাভাস
- মশা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা
- মশা নিধন জনবল ও উপকরণে চাহিদা নিরূপণ এবং ক্রয় প্রক্রিয়া
- কীটনাশকের মান পরীক্ষা, কীটনাশক নিবন্ধন
- মাঠ পর্যায়ে কীটনাশক প্রয়োগ
- মাঠ পর্যায়ের জনবল ও যন্ত্রপাতি
- মশা নিধন কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ
- মশ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সমন্বয়।

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, মশক নিবারনী দপ্তর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, কীটনাশক আমদানীকারক, বিক্রয় ও উৎপাদনকারী, এবং বেসরকারি বালাই/কীট নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের মালিক, কীটতত্ত্ববিদ, জনস্বাস্থ্য গবেষক প্রমুখ ব্যক্তিদের কাছ থেকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম এবং মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি, গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ইত্যাদি হতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.৬ গবেষণা সময়কাল

এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময়কাল ছিল ২০ আগস্ট ২০১৯ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গত পাঁচ বছরের (২০১৫ হতে ২০১৯ সাল) মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে বিবেচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় দুই
গবেষণার ফলাফল

২.১ মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন

ঢাকা শহরের মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান অংশীজন ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং এক্ষেত্রে তাদের যে কার্যক্রম তা চিত্র ২-এ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

চিত্র ২: মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন

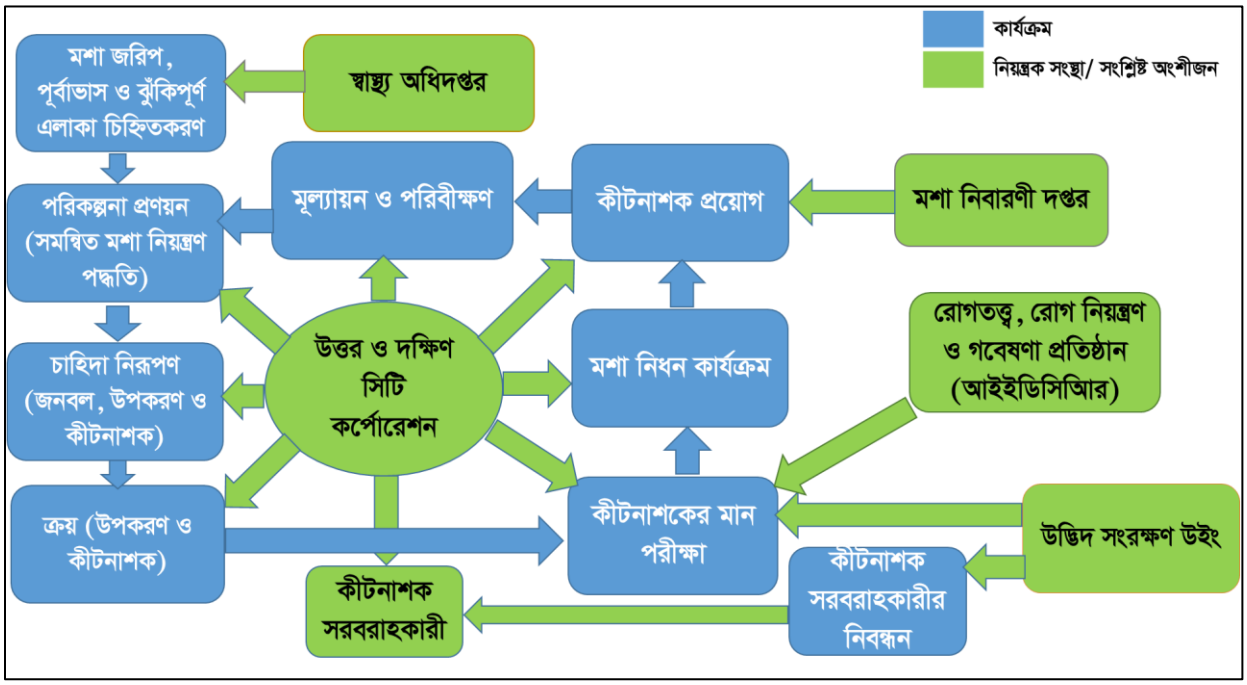

২.১.১ ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন: স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর একটি সংশোধনের মাধ্যমে ২০১১ সাল থেকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে বিভক্ত করা হয়। এই আইন অনুসারে সিটি কর্পোরেশনের অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে- সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন জায়গা থেকে বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ করা, নগরীতে সংক্রামক ব্যধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এ বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন করা, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান কল্পে স্বাস্থ্যমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ উভয় সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের মশক নিধন/নিয়ন্ত্রণ শাখার মাধ্যমে শহরের মশা নিয়ন্ত্রণের কাজ করা হয়ে থাকে। এছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ মশার উৎসস্থল নির্মূলের কাজে সহায়তা করে থাকে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে অনুমোদিত ২৮০ জন মশা নিধন কর্মীর মধ্যে বর্তমানে ২৭০ জন কর্মী আছে। মশা নিধন কর্মীদের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ করার জন্য উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১৪ জন মশক সুপারভাইজার রয়েছে। পক্ষান্তরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডভিত্তিক মশক কর্মীর সংখ্যা ৪০৯ জন এবং মশক সুপারভাইজারের সংখ্যা ২০ জন। সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ এবং ভাণ্ডার ও ক্রয় বিভাগের মাধ্যমে কীটনাশক, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণের চাহিদা নিরূপণ, কীটনাশক নির্বাচন ও ক্রয় এবং এর মান পরীক্ষা করা হয়।

সারণি ২: এক নজরে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

বিষয়	উত্তর সিটি কর্পোরেশন	দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
মোট ওয়ার্ড	৫৪ (৩৬ পুরাতন+১৮টি নতুন)	৭৫ (৫৭ পুরাতন+১৮টি নতুন)
আয়তন	৮২.৬৩৮ ব.কি.	১০৯.২৫১ ব.কি.
জনসংখ্যা	৩৯,৫৭,৩০২	৩৮,৮৩,৪২৩
হোল্ডিং সংখ্যা	১৭২,২৫৪	১৬৫,০০০
মশক নিয়ন্ত্রণ বাজেট ২০১৯-২০	৪৯.৩ কোটি টাকা	৪৩.৩ কোটি টাকা
মশক নিয়ন্ত্রণ বাজেট ২০১৮-১৯	২১.০ কোটি টাকা (সংশোধিত ১৭.৫)	২৬.০ কোটি টাকা (সংশোধিত ১৯.৫২)
মশক নিয়ন্ত্রণ ব্যয় (২০১৮-১৯)	মোট ব্যয় ১৭.৫ কোটি টাকা (কীটনাশক ১৪.০ কোটি টাকা, কচুরিপানা ও আগাছা পরিষ্কার ১.৫ কোটি টাকা, ফগার/হুইল/স্প্রে মেশিন পরিবহন ২.০ কোটি টাকা)	মোট ব্যয় ১৯.৫২ কোটি টাকা (কীটনাশক ১৭.৩৯ কোটি টাকা, কচুরিপানা ও আগাছা পরিষ্কার ০.২৫ কোটি টাকা, ফগার/হুইল/স্প্রে মেশিন পরিবহন ১.৮৮ কোটি টাকা)
যন্ত্রপাতি	হ্যান্ড স্প্রেয়ার-৪৫৯ টি (নতুন ক্রয় ৪৬৩) ফগিং মেশিন-৩২২ টি (নতুন ক্রয় ২০০টি) হুইলব্যারো মেশিন-১০টি	হ্যান্ড স্প্রেয়ার-৪৯৮টি ফগিং মেশিন-৩২৯টি হুইলব্যারো মেশিন-১৭টি
মশক নিধন কর্মী	২৭০ (অনুমোদিত ২৮০ জন)	৪০৯
বাৎসরিক ব্যবহৃত কীটনাশক	এডাল্টিসাইড-৩৪৯,০০০ লিটার লার্ভিসাইড-২৭৯৯ লিটার	এডাল্টিসাইড-২.২ লাখ লিটার (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০১৯) লার্ভিসাইড- ১৮১৫ লিটার (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০১৯)

২.১.২ সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা (সিডিসি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর: স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচির (এইচপিএনএসপি ২০১৭-২২) রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার (সিডিসি) কর্মপরিকল্পনায় এডিসবাহিত রোগ (ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, জিকা) নিয়ন্ত্রণের জন্য ২০১৭-২২ এর মধ্যে যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে - রোগসংক্রমাক কীটের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা, খসরা জাতীয় কৌশল প্রণয়ন এবং এর হালনাগাদকরণ, এডিস মশার জরিপকার্য পরিচালনা করা এবং ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাবের পূর্বাভাস করা, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও জিকা রোগের ক্লিনিক্যাল ব্যবস্থাপনা এবং এই সকল রোগের নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য প্রচারণা করা, এবং কমিউনিটির সক্রিয় সম্পৃক্ততা তৈরি করা।[১০] এর অংশ হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের সহায়তায় রোগ-নিয়ন্ত্রণ শাখা ২০১৭ সাল থেকে বছরে তিনবার (প্রাক বর্ষা মৌসুম, বর্ষা মৌসুম এবং বর্ষা পরবর্তী মৌসুম) এডিস মশার জরিপ কার্য পরিচালনা করে আসছে। যদিও তারা ২০১৩ সাল থেকে বছরে একবার করে এডিস মশার জরিপ করতো।[১১]

২.১.৩ উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর: বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) আইন, ২০১৮ (ধারা ৪) অনুসারে বালাইনাশকের আমদানী, উৎপাদন, পুনঃউৎপাদন, মোড়কজাতকরণ, বিক্রয় ও বিক্রয়ের প্রস্তাবের জন্য উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং-এ উক্ত পণ্যের ব্রান্ডের জন্য নিবন্ধন করতে হয় এবং লাইসেন্স নিতে হয়। মশা নিধনের কাজে ব্যবহৃত সকল জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কীটনাশক এই দপ্তরের কাছে নিবন্ধিত হতে হয়। এবং এই দপ্তরের নিবন্ধিত কীটনাশক ও এর আমদানীকারক এবং উৎপাদকেরাই শুধুমাত্র সিটি কর্পোরেশনের ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। সিটি কর্পোরেশন কীটনাশক ক্রয়ের পর নিবন্ধন অনুযায়ী এর উপাদান সঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা

[১০] এইচপিএনএসপি কর্মপরিকল্পনা, রোগ-নিয়ন্ত্রণ শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিস্তারিত দেখুন, http://www.dghs.gov.bd/images/docs/OP/2018/CDC.pdf,

[১১] Mutsuddy, P., Tahmina Jhora, S., Shamsuzzaman, A., Kaisar, S., & Khan, M. (2019). Dengue Situation in Bangladesh: An Epidemiological Shift in terms of Morbidity and Mortality. *The Canadian journal of infectious diseases & medical microbiology = Journal canadien des maladies infectieuses et de la microbiologie medicale, 2019*, 3516284. doi:10.1155/2019/3516284

করাতে এই দপ্তরের কাছে কীটনাশকের নমুনা পাঠিয়ে থাকে। এছাড়া সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন সময়ের কীটনাশক ক্রয় সম্পর্কিত কমিটিগুলোতে এই দপ্তরের একজন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে।

২.১.৪ রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর): রোগতত্ত্ব ও সংক্রামক রোগ নিয়ে গবেষণা করা এবং এর সাথে সাথে পরজীবী ও রোগ সংক্রামক কীটবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ১৯৭৬ সালে সংসদে একটি বিল অনুমোদনের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগের প্রাদুর্ভাব নজরদারি করে থাকে। উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর অধীনে বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কীটনাশকের নিবন্ধন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কীটতত্ত্ব বিভাগ কীটনাশকের কার্যকরতা পরীক্ষা করে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করে থাকে। এছাড়া সিটি কর্পোরেশন কীটনাশক ক্রয়ের ক্ষেত্রে এর কার্যকরতা পরীক্ষার জন্য আইইডিসিআর-এর কাছে কীটনাশকের নমুনা পাঠিয়ে থাকে।

২.১.৫ মশক নিবারণ দপ্তর: স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৮ সালে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালে এটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে চলে যায় এবং ১৯৮১-৮২ সালে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে আসার পর সরাসরি সিটি কর্পোরেশনের অধীনে কাজ করছে। মশা নিয়ন্ত্রণে এই দপ্তরের সরাসরি কোনো কার্যক্রম নেই। এই দপ্তরের বর্তমান কর্মীর সংখ্যা প্রায় ২৮০ জন, যারা দুই ভাগ হয়ে দুই সিটি কর্পোরেশনের মশক নিধন কর্মী হিসেবে কাজ করছে। এছাড়া দুই সিটি কর্পোরেশনের ক্রয় করা কীটনাশক রাখার পণ্যাগার হিসেবে এর অবকাঠামো ব্যবহৃত হচ্ছে।

২.২ এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে ২০১৯ সালে গৃহীত উদ্যোগ

২০১৯ সালে জুন-জুলাই মাসে ডেঙ্গুর ব্যাপকতা ছড়িয়ে পরার পর গণমাধ্যমের চাপে এবং উচ্চ আদালতের অসন্তুষ্টির পর ডেঙ্গুর ব্যাপকতাকে স্বীকার করে দুই সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজন কিছুটা বিলম্বে হলেও নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করে:

- অকার্যকর কীটনাশক সরবরাহ করায় এবং নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ করতে না পারার কারণে দীর্ঘদিন ধরে কীটনাশক সরবরাহকারী একটি প্রতিষ্ঠানকে উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ৫ মাসের জন্য কালো তালিকাভুক্তকরণ (জুলাই ২০১৯);
- উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং-এর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের মাধ্যমে বিতর্কিতভাবে বন্ধ রাখা কিছু জনস্বাস্থ্য কীটনাশকের আমদানি প্রক্রিয়া পুনরায় উন্মুক্তকরণ (জুলাই ২০১৯);
- নতুন কীটনাশক ক্রয়ের জন্য উভয় সিটি কর্পোরেশন বহিস্থ কীটতত্ত্ববিদ, অন্যান্য দপ্তরের বিশেষজ্ঞসহ সিটি কর্পোরেশনের মশক নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কারিগরি উপদেষ্ট কমিটি গঠন (জুলাই ২০১৯);
- বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা (আগস্ট ২০১৯); যেমন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে কীটতত্ত্ববিদ, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা প্রেষণে উত্তর সিটিতে প্রেরণ; ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনার জন্য 'ওয়ার্ড ডেঙ্গু প্রতিরোধ সেল' গঠন;
- বিদ্যমান কীটনাশকের অকার্যকরতার কারণে নতুন কীটনাশক আমদানি ও প্রয়োগ (আগস্ট ২০১৯);
- ডেঙ্গু মশার উৎস ধ্বংস করার জন্য 'চিরুনি অভিযান'; ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ও জরিমানা (আগস্ট ২০১৯); এবং
- বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে ও তাদের মতামতের ভিত্তিতে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

২.৩ এডিস মশা জরিপ ও ডেঙ্গু রোগের পূর্বাভাস, কীটনাশকের কার্যকরতা নিয়ে সতর্কতা এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ

২.৩.১ এডিস মশা জরিপ ও ডেঙ্গু রোগের পূর্বাভাস

ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব ২০০০ সাল থেকে শুরু হলেও ২০১৪ সাল থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ-নিয়ন্ত্রণ শাখা এডিস মশার ঘনত্ব নির্ণয়ের জরিপ কার্য পরিচালনা করে থাকে, এবং ২০১৭ সাল থেকে বছরে তিনবার জরিপ (প্রাক বর্ষা মৌসুম, বর্ষা মৌসুম ও বর্ষা পরবর্তী মৌসুম) করা হয়। ঢাকা শহরের দুই সিটি কর্পোরেশনের ৯৮টি ওয়ার্ডের ১০০টি এলাকায় পরিচালিত জরিপগুলোতে সারাবছর জুড়ে এডিস মশার লার্ভা ও পিউপার উচ্চ ঘনত্ব দেখা যায়।

২০১৯ সালের প্রাক বর্ষা মৌসুম (৩-১২ মার্চ) এডিস মশার জরিপে বলা হয়েছিল জরিপকৃত ১০০টি এলাকার মধ্যে ৮৬ শতাংশ স্থানে এডিস মশা অত্যান্ত বেশি। এই জরিপে ব্যবহৃত ব্রুটো ইনডেক্সে (Breteau Index) দেখা যায় ঢাকা উত্তরের এডিস মশার লার্ভার গড় ঘনত্ব ছিল ২১ এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের গড় ঘনত্ব ছিল ২৬ এর অধিক। এই জরিপের ফলাফলে এডিসের ঘনত্ব ক্ষতিকর মাত্রার চেয়ে বেশি বলে সিটি করপোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করা হলেও তখন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পরবর্তীতে বর্ষা মৌসুম

জরিপ (১৭-২৭ জুলাই) পর দেখা যায় এডিস মশার লার্ভার ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়ে উত্তর সিটিতে ৫৭ এবং দক্ষিণে ৭৯ হয়েছে। এছাড়া পূর্ণবয়স্ক মশার সংখ্যা প্রাক বর্ষা মৌসুমের চেয়ে (৩৬টি) বর্ষা মৌসুমে (২০৭টি) কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়।

এই দুই জরিপের বাইরে ৩১ জুলাই-৪ আগস্ট ২০১৯ সময়কালে করা রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার বিশেষ জরিপে ঢাকা শহরের ১৪টি এলাকার মধ্যে ১২টিতে ঝুঁকিপূর্ণ মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি মশার লার্ভা পাওয়া যায়। একটি এলাকায় ২০ শতাংশের বেশি পাত্রে লার্ভা পাওয়া গেলে পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয় অথচ এই জরিপে পাঁচটি স্থানে ৮০ শতাংশের বেশি পাত্রে লার্ভা পাওয়া গেছে।[১২] এই পাঁচটি এলাকা হচ্ছে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কমলাপুর বিআরটিসি বাস ডিপো, কমলাপুর রেলওয়ে কলোনি, মহাখালী বাস টার্মিনাল ও শাহজাহানপুর বস্তি। রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার এই জরিপ কার্যক্রম শুধুমাত্র ঢাকা শহর কেন্দ্রিক হওয়ার কারণে ঢাকার বাইরের এডিস মশার ঘনত্ব জানা যায় না ও ডেঙ্গু রোগের পূর্বাভাস পাওয়া যায় না।

২.৩.২ কীটনাশকের কার্যকরতা নিয়ে গবেষণা ও সতর্কতা

বাংলাদেশে *এডিস ইজিপ্টাই* মশার কোন কোন কীটনাশকের প্রতি প্রতিরোধী ক্ষমতা (Resistance) তৈরি হয়েছে তা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক উদারাময় গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ (ICDDR,B) একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই গবেষণায় কোন কীটনাশক কার্যকরতা হরিয়েছে এবং কোন কীটনাশকের মশা নিধনের সামর্থ্য রয়েছে (Susceptibiltiy) তা এই গবেষণায় তুলে ধরা হয়। অভি ট্র্যাপের মাধ্যমে ঢাকা শহরের নয়টি এলাকা এবং টাঙ্গাইল, রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ এবং বান্দরবান জেলার দুইটি করে এলাকা থেকে এডিস মশার ডিম সংগ্রহ করা হয়। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি), আটলান্টা, যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহৃত বোতল বায়োসে (Bottle bioassay) পদ্ধতি ব্যবহার করে পারমিথ্রিন (পাইরিথ্রয়েড), ডেল্টামিথ্রিন (পাইরিথ্রয়েড), ম্যালাথিউন (অর্গানোফসফেট) এবং বেন্ডিওকার্ব (কার্বামেট) এই চারটি কীটনাশকের প্রতি মশার প্রতিরোধী ক্ষমতা (Resistance) ও মশক নিধনের সামর্থ্য (Susceptibiltiy) পরীক্ষা করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা মাত্রা অনুসারে প্রতিরোধী শক্তি ও মশকনিধনের সামর্থ্য পরীক্ষায় যদি ৯৮%-১০০% মশা মারা যায় তাহলে উক্ত কীটনাশকের মশা নিধনের সামর্থ্য আছে, যদি ৯০%-৯৭% মশা মারা যায় তাহলে উক্ত কীটনাশকের প্রতি মশার প্রতিরোধী ক্ষমতা তৈরি হয়েছে, এক্ষত্রে কীটনাশকের ডোজ ২/৫/১০ গুণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং যদি ৯০% এর কম মশা মারা যায় তাহলে এই কীটনাশকের প্রতি মশার প্রতিরোধী শক্তি তৈরি হয়েছে বলে ধরা হয়।

দেখা যায় প্রায় সকল এলাকার মশার পারমিথ্রিনে প্রতিরোধী ক্ষমতা তৈরি হয়েছে, এই কীটনাশকে মশার মৃত্যুহার পাওয়া যায় ০-১৪.৮%, এবং ডোজ দ্বিগুণ করলে মৃত্যু হার হয় ৫.১-৪৪.৪%। ডেল্টামেথ্রিন এবং ম্যালাথিউন এলাকাভেদে কার্যকর এবং বেন্ডিওকার্ব সকল এলাকায় কার্যকর হিসেবে দেখা যায়। ঢাকার দুইটি সিটি কর্পোরেশ কীটনাশকের যে মিশ্রনটি (পারমিথ্রিন+টেট্রামিথ্রিন+প্রালেথ্রিন) মশা নিধনের কাজে ব্যবহার করে তারমধ্যে কিলিং এজেন্ট হচ্ছে পারমিথ্রিন।

আইসিডিডিআর,বি তাদের গবেষণা ফলাফল ঢাকার দুইটি সিটি কর্পোরেশনসহ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, সিডিসি, ইউএসএ, এবং গবেষক ও কীটতত্ত্ববিদদের নিয়ে ২০১৮ সালের মে মাসে একটি সভার মাধ্যমে প্রকাশ করে। তারা সেখানে সুপারিশ করে যে, যেহেতু পারমিথ্রিনে মশার উচ্চমাত্রার প্রতিরোধী ক্ষমতা তৈরি হয়েছে সেহেতু এই কীটনাশক পরিবর্তন করে বেন্ডিওকার্ব ব্যবহার করা যেতে পারে। যেহেতু বেন্ডিওকার্ব বাংলাদশে নিবন্ধিত নয় সেহেতু বেন্ডিওকার্ব বাংলাদেশে নিবন্ধিত না হওয়া পর্যন্ত ডেল্টামিথ্রিন বা ম্যালাথিউন ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া নিয়মিতভাবে বিভিন্ন নিবন্ধিত কীটনাশকের প্রতিরোধী ক্ষমতা পরিবীক্ষণ করতে হবে এবং বিকল্প কি কি কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে সে বিষয়ে গবেষণা করার সুপারিশ করা হয়।[১৩]

২.৩.৩ আগাম পূর্বাভাস এবং গবেষণাকে গুরুত্ব না দেওয়া

জাতীয় নির্বাচনের বছর হওয়ার কারণে আইসিডিডিআর,বি এর গবেষণার ফলাফল প্রকাশের সভায় একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এই গবেষণা তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশ না করার জন্য বলেন। আইইডিসিআর ও আইসিডিডিআরবিকে এই বিষয়টি পুনরায় পরীক্ষা করে দেখতে বলেন এবং এই কীটনাশক কিউলেক্স মশার ক্ষেত্রে কার্যকর কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে বলেন। আইসিডিডিআর,বি কিউলেক্স

[১২] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিস্তারিত দেখুন: http://www.dghs.gov.bd/index.php/en/home/5175-health-bulletin-on-current-dengue-situation-published-by-cdc-dghs

[১৩] Mohammad Shfiul Alam et al. (2018), Baseline survey of insecticide resistence in Aedse aegypti in Bangladesh, ICDDR,B and CDC, Atlanta, USA, unpublished

মশার উপর পরীক্ষা করে দেখেছে যে এটা কিউলেক্সের জন্যও কার্যকর নয়। আইসিডিডিআর,বি-এর প্রতিবেদনকে গুরুত্ব না দিয়ে পরবর্তীতে কীটনাশকের প্রতি মশার প্রতিরোধী শক্তি পরীক্ষা না করেই ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন যথাক্রমে (জ্বালানিসহ) ১৪ কোটি এবং ১৭.৩৯ কোটি টাকার একই কীটনাশক (পারমিথ্রিনসহ সংমিশ্রণ) পুনরায় ক্রয় করে। পরবর্তীতে ডেঙ্গুর ব্যাপক প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর আইসিডিডিআর,বি'র এই প্রতিবেদন জুন মাসের শেষের দিকে গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।

রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার প্রাক বর্ষা মৌসুম জরিপের ফলাফলে এডিস মশার লার্ভার উচ্চ ঘনত্ব পাওয়া গেলে এ বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সতর্ক করা হয় যে যদি কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে মশা নিয়ন্ত্রণ এবং তার যথাযথ ব্যবস্থাপনা করা না হয়, তাহলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। কিন্তু এডিস মশা নির্মূলের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে জুন মাস থেকে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব শুরু হয় এবং জুলাই থেকে মহামারী আকারে দেখা গেলেও সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ না করে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের একাংশ এ বিষয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য দিতে থাকে এবং কেউ কেউ একে 'গুজব' হিসেবে অভিহিত করে। এ বছরসহ বিগত বছরগুলোতেও 'ডেঙ্গু মশার প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র মানুষের ঘরের ভেতরে, এক্ষত্রে সিটি কর্পোরেশনের কিছু করার নেই' ইত্যাদি মন্তব্য করা হয়। কারও বাসায় মশা পাওয়া গেলে তার বিরূদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়। যদিও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার বিশেষ মশা জরিপে সবচেয়ে বেশি এডিস মশার লার্ভা পাওয়া যায় বাস টার্মিনাল, বাস ডিপোর পরিত্যক্ত টায়ারে, রেলস্টেশনে, সরকারি হাসপাতালে ইত্যাদি জনসমাগম স্থলে। সরকারি, বেসরকারি হাসপাতালের ডেঙ্গু রোগীর ভীড়, গণমাধ্যমের চাপে এবং উচ্চ আদালত কর্তৃক সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশের পর দুই সিটি কর্পোরেশন ডেঙ্গু রোগের ব্যাপকতাকে স্বীকার করে নিয়ে কিছু কার্যক্রম শুরু করে।

২.৩.৪ ডেঙ্গুর প্রকৃত চিত্র চিহ্নিত করায় ঘাটতি

বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছে ২০০০ সাল থেকে। প্রতি বছর ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই অধিক আক্রান্ত এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু ঢাকা শহরে দুইটি সিটি কর্পোরেশন এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গু আক্রান্তের প্রকৃত চিত্র চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের এই ধরনের কোনো কার্যক্রম নেই। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের দৈনিক ডেঙ্গু স্ট্যাটাস রিপোর্টের '২০১৯ সালের ডেঙ্গু ও সন্দেহজনক ডেঙ্গু রোগীর তথ্যে' ঢাকায় সকল সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যে মাত্র ৪১টি হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ডেঙ্গু রোগী এবং ৬৪ জেলার সিভিল সার্জন কর্তৃক পাঠানো তথ্য সংকলন করা হয়। এক্ষেত্রে তারা শুধুমাত্র হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার রোগীর সংখ্যা বিবেচনা করে থাকে। রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রগুলো থেকে পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া ডেঙ্গু রোগী যারা আক্রান্ত হয়েছে কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি হয়নি, তাদের তথ্য সংকলন করা হয়নি।[১৪] উল্লেখ্য, ঢাকায় শুধুমাত্র বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যাই প্রায় ৬ শতাধিক; এবং রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় ১০০০।[১৫]

এছাড়া ডেঙ্গু রোগে প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রেও দুর্বলতা রয়েছে। রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের কাছে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এমন ২০৩টি তথ্য এসেছে,তার মধ্যে তারা ১১৬টি তথ্য পর্যালোচনা করে ৬৮টি মৃত্যু ডেঙ্গুজনিত বলে নিশ্চিত হয়েছে।[১৬] যদিও বেসরকারি তথ্য অনুযায়ী ডেঙ্গু মৃত্যুর সংখ্যা ২২৩ জন।[১৭] এছাড়া দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের একাংশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করে দেখানো চেষ্টা করেন যে, বাংলাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা এবং মৃত্যুর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরও তাদের 'হেলথ বুলেটিন: বাংলাদেশ ডেঙ্গু পরিস্থিতি ২০১৯'-এর প্রথমেই ডেঙ্গুর বৈশ্বিক পরিস্থিতি দেখায়। এক্ষত্রে শুধু গুটিকয়েক হাসপাতালের খণ্ডিত পরিসংখ্যান দিয়ে অন্যান্য দেশের ডেঙ্গু আক্রান্তের হারের সাথে তুলনামূলক চিত্র দিয়ে ডেঙ্গু পরিস্থিতির মাত্রা কম দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

সারাদেশব্যাপী ডেঙ্গু রোগের প্রকৃত চিত্র চিহ্নিত করতে না পারার কারণে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা ও কৌশল নিধারণ ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উল্লেখ্য, কলকাতার পৌরসংস্থানে প্রতি ওয়ার্ডে দুইজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী রয়েছে যার কাজ হচ্ছে উক্ত ওয়ার্ডের প্রতিটি

[১৪] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিস্তারিত দেখুন: http://www.dghs.gov.bd/images/docs/Notice/2019/dengue/Dengue_20190918.pdf
[১৫] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত নিবন্ধিত বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও রোগ-নির্ণয়কেন্দ্রের তালিকা থেকে প্রাপ্ত
[১৬] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিস্তারিত দেখুন: http://www.dghs.gov.bd/images/docs/Notice/2019/dengue/Dengue_20190918.pdf
[১৭] দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯

ঘরে ঘরে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা এবং এই তথ্য অনলাইনের মাধ্যমে স্টেট হেলথ ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে থাকে, এবং ডেঙ্গু রোগী সম্পর্কিত তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে র‍্যাপিড একশন টিম ঐ এলাকায় গিয়ে সেখানকার ডেঙ্গু প্রজনন ক্ষেত্র চিহ্নিত ও ধ্বংস করে।[১৮]

২.৪ মশা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা

২.৪.১ জাতীয় নীতি, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা না থাকা

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৭-২২ এ সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার (সিডিসি) কর্মপরিকল্পনায় এডিসবাহিত রোগ (ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, জিকা) নিয়ন্ত্রণের জন্য যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার কথা রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে - এডিস মশার সমন্বিত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা, খসড়া জাতীয় কৌশল প্রণয়ন এবং এর হালনাগাদকরণ, এডিস মশার জরিপকার্য পরিচালনা করা এবং ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের পূর্বাভাস করা, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও জিকা রোগের ক্লিনিক্যাল ব্যবস্থাপনা এবং এসব রোগের নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য প্রচারণা করা, এবং কমিউনিটির সক্রিয় সম্পৃক্ততা তৈরি করা।[১৯] এডিসবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য যে জাতীয় কৌশল প্রণয়ন করার কথা তা খুব প্রাথমিক অবস্থায় আছে। ফলে বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে এডিস নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল নেই। এছাড়া এ বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব কোনো ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাও নেই।

২.৪.২ এলাকাভিত্তিক বা আঞ্চলিক পরিকল্পনা না থাকা

জরুরি ডেঙ্গু পরিস্থিতিতে দুই সিটি কর্পোরেশন মশক নিধন কর্মীদের ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা তাদের ওয়েবসাইটে আপলোড করলেও অন্য সময়ে ওয়ার্ডভিত্তিক বা আঞ্চলিক পর্যায়ে যথাযথ কর্মপরিকল্পনায় এবং তা ঘাটতি ছিল।

২.৪.৩ এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সকল পদ্ধতির সমন্বয় না করা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংক্রামক কীটের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা হ্যান্ডবুকে (Handbook for integrated vector management) এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে চারটি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে:[২০]

- **পরিবেশগত পদ্ধতি (environmental):** যার মধ্যে রয়েছে এডিস মশার উৎস স্থল বা প্রজনন ক্ষেত্র নির্মূল করা;
- **যান্ত্রিক পদ্ধতি (mechanical):** মশা ধরার ফাঁদ ব্যবহার;
- **জৈবিক পদ্ধতি (biological):** প্রাকৃতিকভাবে মশার শুককীট নিধন করা, গাপ্পিফিশ, ব্যাকটেরিয়া, বোটানিক্যাল কীটনাশক ব্যবহার ইত্যাদি; এবং
- **রাসায়নিক পদ্ধতি (chemical):** রাসায়নিক প্রয়োগের মাধ্যমে মশা নিধন করা (অ্যাডাল্টিসাইড, লার্ভিসাইড), বায়োর‍্যাশনাল কীটনাশক ব্যবহার ইত্যাদি।

রাসায়নিক পদ্ধতি ছাড়া আর সব পদ্ধতিতেই জনসম্পৃক্ততার প্রয়োজন হয়। বিশেষকরে পরিবেশগত ব্যবস্থানপার ক্ষেত্রে জনসম্পৃক্ততার বেশি প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে শুধুমাত্র রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহার করে। বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব থাকলেও বাকি পদ্ধতিগুলো সিটি কর্পোরেশনের পরিকল্পনায় ও বাজেটে কখনই রাখা হয় নি।

দুই সিটি কর্পোরেশনই শুধুমাত্র সাধারণ কিউলেক্স মশাকে লক্ষ্য করে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে। এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায় হচ্ছে এডিস মশার উৎস নির্মূল বা প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস করা। কিন্তু এই বছরের ব্যাপক প্রাদুর্ভাবের আগে এডিস মশার উৎস নির্মূলের জন্য কোনো কার্যক্রম নেওয়া হয়নি। দুই সিটি কর্পোরেশনের মশা নিয়ন্ত্রণ/ নিধন কার্যক্রম অধিকাংশ সময়েই অ্যাডাল্টিসাইড-নির্ভর (পূর্ণবয়স্ক মশা নিধন)। লার্ভিসাইড (মশার শুককীট নিধন) মাঝে মাঝে প্রয়োগ করা হলেও তা নিয়মিত ছিল না। বিশেষজ্ঞমতে অ্যাডাল্টিসাইড ৩০% এবং লার্ভিসাইড ৮০% কার্যকর। তবে অ্যাডাল্টিসাইডের চেয়ে লার্ভিসাইড এবং প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস করা সহজ, অনেক বেশি কার্যকর ও স্বল্প খরচের হলেও দুই সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম সব সময় অ্যাডাল্টিসাইড কেন্দ্রিক; এর কারণ হচ্ছে - প্রথমত এই কার্যক্রম

[১৮] কলকাতা পৌরসংস্থান, বাজেট স্টেটমেন্ট ২০১৯-২০, বিস্তারিত দেখুন:
https://www.kmcgov.in/KMCPortal/downloads/KMC_Budget_English_2019_2020.pdf
[১৯] এইচপিএনএসপি কর্মপরিকল্পনা, রোগ-নিয়ন্ত্রণ শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিস্তারিত দেখুন,
http://www.dghs.gov.bd/images/docs/OP/2018/CDC.pdf,
[২০] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, Handbook for integrated vector management, বিস্তারিত দেখুন:
https://www.who.int/neglected_diseases/vector_ecology/resources/9789241502801/en/

মানুষের নজরে বেশি পড়ে, এবং দ্বিতীয়ত এই কার্যক্রমে ক্রয়ের সুযোগ বেশি এবং দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয় (কারণ এক্ষেত্রে কীটনাশক, ফগার মেশিন এবং মেশিন চালানোর জন্য জ্বালানি প্রয়োজন হয়)।

২.৪.৪ উপযুক্ত কীটনাশক নির্ধারণ না করা

ঢাকার দুইটি সিটি কর্পোরেশন এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমন্বিত পদ্ধতি প্রয়োজন তার মধ্যে শুধুমাত্র রাসায়নিক পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে থাকে। এই একটিমাত্র পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও উপযুক্ত কীটনাশক নির্ধারণ ও এর চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। উপযুক্ত কীটনাশক নির্ধারণের ক্ষেত্রে কীটনাশকের জৈবিক কার্যকরতা, কীটনাশকের প্রতি মশার প্রতিরোধী ক্ষমতা তৈরি হওয়া, কীটনাশকের মশা নিধনের সামর্থ্য, কীটনাশকের ব্যবহার পদ্ধতি, স্বাস্থ্য ঝুঁকি, পণ্যের নিবন্ধন, পণ্যের নিরাপদ ব্যবহার, বন্টন ও মজুতের সামর্থ্য, পণ্যের মূল্য ছাড়াও পরিচালন ব্যয় ইত্যাদি বিবেচনা করা প্রয়োজন হলেও দুই সিটি কর্পোরেশনই এসব বিষয় বিবেচনা না করেই কীটনাশক নির্ধারণ করে থাকে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করে উপযুক্ত কীটনাশক নির্ধারণ করার জন্য ২০১৭ সালে একটি কমিটি করা হয়েছিল যেখানে কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ভান্ডার ও ক্রয় কর্মকর্তা, আইন কর্মকর্তা ও পাঁচজন কাউন্সিলর, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) কীটতত্ত্ব বিভাগের একজন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের একজন উপপরিচালক ছিলেন। কিন্তু এই কমিটি পরবর্তীতে নিয়মিতভাবে কার্যকর ছিল না। এই বছরে ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের পর আবারও উভয় সিটি কর্পোরেশনে একটি করে কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি করা হয়েছে, যেখানে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার প্রতিনিধি, আইইডিসিআরের প্রতিনিধি, আইসিডিডিআরবি'র প্রতিনিধি, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর প্রতিনিধি, কীটতত্ত্ববিদ ও বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এছাড়া দুই সিটি কর্পোরেশনের একটিতেও কীটতত্ত্ববিদ নেই। কীটতত্ত্ববিদ ছাড়াই কীটনাশক নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কীটনাশকের কার্যকরতা নিয়ে আইসিডিডিআর'বি-এর গবেষণাকেও আমলে নেওয়া হয়নি। কীটনাশক প্রয়োগের মেশিন ক্রয়ের ক্ষেত্রেও পরিকল্পনার ঘাটতি লক্ষ করা যায়, কারণ মেশিনগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর দেখা যায় যে এর যন্ত্রাংশ বাংলাদেশে পাওয়া যায় না।

২.৪.৫ পণ্যের চাহিদা নিরূপন বা প্রাক্কলন

রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক বছরের কীটনাশকসহ বিভিন্ন উপকরণের চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের আয়তন, রোগের প্রাদুর্ভাব, বিগত বছরের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন হলেও দুই সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে কীটনাশক ক্রয়ের পরিমাণের তারতম্য লক্ষ করা যায় (সারণি ৩)।

সারণি ৩: দুই সিটি কর্পোরেশনের কীটনাশক বাবদ বার্ষিক ব্যয়

অর্থ বছর	কীটনাশক ক্রয় (কোটি টাকায়)	
	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশ	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
২০১৬-১৭ (সংশোধিত)	তথ্য পাওয়া যায় নি	১৫.৯৬
২০১৭-১৮ (সংশোধিত)	১৫.০	১২.০
২০১৮-১৯ (সংশোধিত)	১৪.০	১৭.৩৯
২০১৯-২০ (বাজেট)	৩০.০	৩৮.০

এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে বর্তমান অর্থবছরের বাজেটে (২০১৯-২০) বিশেষ কোনো কর্মসূচি না রেখে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কীটনাশক ক্রয়ের বাজেট প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়েছে। পক্ষান্তরে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কোনো কোনো বিশেষ কার্যক্রম (যেমন, আইটসোর্সিং এর মাধ্যমে মশক নিয়ন্ত্রণ) তাদের বাজেটে রাখলেও কীটনাশকের বাজেট তারাও প্রায় দ্বিগুণ করেছে, যদিও শুধু কীটনাশক প্রয়োগ করে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

২.৫ কীটনাশক ও উপকরণ ক্রয়

২.৫.১ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নে অনিয়ম

প্রত্যেক অর্থবছরের শুরুতে ক্রয়কারী কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প বা রাজস্ব বাজেটের জন্য অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা উক্ত প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে।[২১] এছাড়া ১ (এক) কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে ক্রয় পরিকল্পনা সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার কথাও বলা হয়েছে।[২২] ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কীটনাশক ও মশা নিধন উপকরণের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইটে থাকলেও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের এ বিষয়ক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা লক্ষ করা যায় না। উল্লেখ্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটেও তা প্রকাশ করা হয়নি। এক্ষত্রে ক্রয় পরিকল্পনায় স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে।

২.৫.২ দরপত্রের দলিল প্রস্তুতিতে অনিয়ম

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কীটনাশক ক্রয় প্রক্রিয়ায় যথা সময়ে শেষ করতে না পারার কারণে নভেম্বর ২০১৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সাল পর্যন্ত কীটনাশকশূন্য ছিল। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সিপিটিইউ পরিচালিত ইজিপি পোর্টালের মাধ্যমে মশক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কীটনাশক ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ২০১৫ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত যে উন্মুক্ত দরপত্রগুলো দেয় তাতে দেখা যায়, দরপত্রে কীটনাশক বা কীটনাশকের উপাদান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিবরণ দেওয়া নেই, দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোনটিতে কীটনাশকের পরিমাণের কথা উল্লেখ থাকলেও কোনো কোনোটিতে ছিল না এবং দরপত্রে অংশগ্রহণের যোগ্যতা কি হবে তা কোনোটিতে ছিল এবং কোনোটিতে ছিল না। যদিও সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী চাহিদাকৃত পণ্যের বিস্তারিত বিনির্দেশের (specification) বিবরণ দলিলে, দরপত্রে বা প্রস্তাব দলিলে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।[২৩] সিটি কর্পোরেশন যেহেতু দরপত্রে কীটনাশকের বিনির্দেশের বিবরণ দিচ্ছে না সেহেতু একই ধরনের কীটনাশক ১০-১২ বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এছাড়া কীটনাশকের বিবরণে শুধুমাত্র ব্যবহার উপযোগী তৈরি পণ্য চাওয়া হয়, ফলে তৈরি কীটনাশকে ব্যবহৃত সক্রিয় উপাদানের মাত্রা কম দিলেও কম দরের কারণে কার্যাদেশ পাওয়ার সুযোগ থাকে।

২.৫.৩ দরপত্র পদ্ধতিতে অনিয়ম

সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী বিশেষ পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট কোনো ক্রয়ের ক্ষেত্রে অথবা মূল্য-সীমার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য ক্রয় পদ্ধতির কোন একটি পদ্ধতির ব্যবহার অধিকতর যুক্তিযুক্ত না হলে, পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি সবার আগে বিবেচনা করার কথা বলা হয়েছে।[২৪] এক্ষেত্রে উত্তর সিটি কর্পোরেশন সিপিটিইউ পরিচালিত ইজিপি পোর্টালের মাধ্যমে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে মশা নিয়ন্ত্রণের কীটনাশক ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করলেও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কীটনাশক ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে না গিয়ে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে।

এক্ষত্রে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অধীন ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, নারায়ণগঞ্জকে সরাসরি কীটনাশক ক্রয়ের কার্যাদেশ প্রদান করে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে তারা এই সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ৩৭৮ টাকা লিটার দরে ৭ লাখ লিটার অ্যাডাল্টিসাইড এবং ৪ হাজার লিটার লার্ভিসাইড ক্রয়ের কার্যাদেশ প্রদান করে। কিন্তু 'বালাইনাশক (পেস্টিসাইড) আইন, ২০১৮' অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং-এর অধীনে কীটনাশকের কোনো ব্র্যান্ডের নিবন্ধন ছাড়া কোনো কীটনাশক আমদানি, উৎপাদন, পুনরুৎপাদন, মোড়কজাতকরণ, পুনঃমোড়কজাতকরণ, বিক্রয় অথবা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব ও মজুদ অথবা কোনো প্রকার বিজ্ঞাপন প্রচার করতে পারবে না।[২৫] ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডের কোনো ব্র্যান্ড আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত নয়।

সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির যোগ্যতার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কার্য সম্পাদন, পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের জন্য পেশাগত ও কারিগরি যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকা, সন্তোষজনকভাবে পণ্য উৎপাদন ও তৈরির সামর্থ্য, বিক্রয় পরবর্তী সেবা প্রদানের সুবিধা থাকতে হবে বলা হলেও এ বিষয়ে তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা, কারিগরি বা ব্যবস্থাপনা জ্ঞান নেই।[২৬] এই বিধিমালা

---

[২১] *সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮*, বিধি ১৬ (৯)।
[২২] *সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮*, বিধি ১৬ (১১)।
[২৩] *সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮*, বিধি ৪ (২) (ছ) (৩) (গ)।
[২৪] *সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮*, বিধি ৬১ (১)।
[২৫] *বালাইনাশক (পেস্টিসাইড) আইন, ২০১৮*, ধারা ৪।
[২৬] *সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮*, বিধি ৪৮ (২) (ক) (অ, ই, ঈ, উ)।

অনুযায়ী ক্রয়কারী কেবল একজন সরবরাহকারী বা ঠিকাদারকে দরপত্র দাখিলের জন্য যেসব শর্তে আহ্বান জানাতে পারবে সেগুলো হচ্ছে[২৭] -

(ক) যদি পেটেন্ট, ব্যবসায়িক গোপনীয়তা এবং একক স্বত্বাধিকারের (copyrights) কারণে একই ধরনের পণ্য প্রস্তুতকরণে অন্যদেরকে নিবৃত্ত রাখা হয়, সেইক্ষেত্রে একক স্বত্বাধিকারভুক্ত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা কেবলমাত্র একক স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতেই ক্রয়ের ক্ষেত্রে;

(খ) কোন নির্দিষ্ট উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী বা পরিবেশকের প্রকল্পের কার্য সম্পাদনের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে চুক্তির শর্তানুযায়ী উক্ত উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী বা পরিবেশকের নিকট হইতে জটিল ধরনের প্ল্যান্টের গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ ক্রয় করিতে হইবে মর্মে কোন পূর্বশর্ত থাকিলে;

(গ) যে সকল পণ্য কোন একক ডিলার বা উৎপাদনকারী কর্তৃক বিক্রয় করা হয় এবং যাহার এমন কোন সাব-ডিলার নাই যাহারা নিম্নতর মূল্যে উক্ত পণ্য বিক্রয় করিতে পারে, বা অধিকতর সুবিধাজনক শর্তে উহার উপযুক্ত কোন বিকল্প পণ্য প্রাপ্তির সুযোগ নাই;

(ঘ) ক্রয়ের সময়ে বলবৎ যুক্তিসঙ্গত বাজারমূল্যে পচনশীল পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে (যেমনঃ তাজা ফল, সব্জী এবং অনুরূপ পণ্য);

(ঙ) ব্যতিক্রমী সুবিধাজনক শর্তে পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয়, যদি উক্ত পণ্য অতি সাম্প্রতিক কালে উৎপাদিত, অব্যবহৃত এবং উৎপাদনকারীর গ্যারান্টিযুক্ত হয়;

(চ) কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে সরাসরি কৃষকদের নিকট হইতে সরাসরি কৃষিপণ্য এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ক্রয় করা হইলে;

(ছ) বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানাধীন শিল্প ও কারখানা হইতে সরকারের নিজস্ব অর্থে পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয় করা হইলে;

(জ) কোন সরকারী বা বিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত বিনির্দেশ অনুসারে স্থানীয় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান হইতে কোন বিশেষায়িত পণ্য ক্রয় করা হইলে;

(ঝ) বিদ্যমান সরঞ্জামাদির খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ক্ষেত্রে, সরবরাহকারীর পরিবর্তনের ফলে যদি সংগৃহীতব্য বা প্রাপ্তব্য খুচরা যন্ত্রাংশ বা সেবা, বিদ্যমান স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি, যন্ত্রাংশ বা সেবার ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপনযোগ্য না হয়;

(ঞ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে উদ্ভূত কোন জরুরি পরিস্থিতি বা অনুরূপ সংকট মোকাবেলায় তফসিল-২ এ বর্ণিত মূল্যসীমার মধ্যে পণ্য, কার্য এবং সেবা ক্রয় করা হইলে;

(ট) তফসিল-২ এ বর্ণিত মূল্যসীমা অতিক্রম না করা সাপেক্ষে, অতি জরুরি বা প্রয়োজনীয় পণ্য, কার্য এবং সেবা ক্রয় (যথা: ক্যাটারিং সেবা, অ্যামবুলেন্স সেবা, পরিবহণ সেবা, অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, প্লামবিং সেবা, কাঠের কাজ সংক্রান্ত সেবা, স্থাপত্য সেবা, ইত্যাদি)।

তবে উপরোক্ত কোনো শর্তই ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডকে সরাসরি দরপত্রে আহবানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

২.৫.৪ দরপত্র পদ্ধতির কারণে আর্থিক ক্ষতি

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডকে প্রতি লিটার কীটনাশক ৩৭৮ টাকা দরে কার্যাদেশ দেওয়ায় প্রতি লিটার কীটনাশক ক্রয়ে ১৬১ টাকা ক্ষতি হয়েছে, কারণ তারা লিমিট এগ্রোপ্রোডাক্ট নামে যে প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এই কীটনাশক ক্রয় করে সেই একই প্রতিষ্ঠান উত্তর সিটির উন্মুক্ত দরপত্রে একই কীটনাশকের জন্য প্রতি লিটারের দর ২১৭ টাকা প্রস্তাব করে। এর ফলে কীটনাশক বাবদ মোট ক্রয়ের ৪০ শতাংশ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। সরকারি ক্রয় বিধিমালা অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী প্রথমে মূল্য প্রস্তাব আহবান করবে এবং দরপত্রদাতার সাথে দরকষাকষি করবে।[২৮] কিন্তু এক্ষেত্রে কীটনাশকের বাজার দর বিবেচনা করে উপযুক্ত দর কষাকষি করা হয়নি।

২.৫.৫ দরপত্রের দলিল প্রক্রিয়াকরণ ও কার্যাদেশ প্রদানে অনিয়ম

কীটনাশক ক্রয়ে ধাপে ধাপে কমিশন আদায়ের অভিযোগ পাওয়া যায়, যেমন বিল নেওয়ার সময়, পণ্যগারে কীটনাশক সরবরাহের সময় ইত্যাদি, তবে অভিযোগকারীরা টাকার পরিমাণ উল্লেখ করেন নি।

[২৭] *সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮*, বিধি ৭৬ (১)।

[২৮] *সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮*, বিধি ৭৫(৩)।

২.৬ কীটনাশকের মান নিয়ন্ত্রণ

ঢাকার দুইটি সিটি কর্পোরেশন কীটনাশক ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরবরাহকারী কর্তৃক কীটনাশক পণ্যাগারে সরবরাহ করার পর এই কীটনাশকের মান ও কার্যকরতা তিনটি ধাপে পরীক্ষা করা হয়-

১. সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মাঠ পর্যারের কার্যকরতা পরীক্ষা, কীটনাশক মাঠ পর্যায়ে কার্যকর হলে;
২. রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক কার্যকরতা পরীক্ষা (efficacy test); এবং
৩. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এ নিবন্ধিত কীটনাশকের বিবরণ অনুযায়ী সকল উপাদান যথাযথভাবে আছে কিনা তা পরীক্ষা করা।

২.৬.১ কীটনাশকের মাঠ পর্যায়ের কার্যকরতা পরীক্ষায় সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

রোগসংক্রামক কীট নিয়ন্ত্রণ বা মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে মশার কীটনাশক প্রতিরোধী ক্ষমতা তৈরি হয়েছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করা জরুরি। ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন ১০-১২ বছর ধরে মশা নিয়ন্ত্রণে একই কীটনাশক (পারমিথ্রিন) ব্যবহার করলেও কীটনাশকের মশা নিধনের সামর্থ্য (susceptibility) ও কীটনাশক প্রতিরোধী ক্ষমতা (resistance) পরীক্ষা করানো বা কীটনাশক পরিবর্তন করার কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যায় নি। মাঠ পর্যায়ে কীটনাশকের কার্যকরতা পরীক্ষার জন্য সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব কোনো ল্যাবরেটরি ও কীটতত্ত্ববিদ নেই।

২.৬.২ কীটনাশকের কার্যকরতা পরীক্ষার (Efficacy test) সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম-দুর্নীতি

বিভিন্ন ধরনের জনস্বাস্থ্য কীটনাশক পরীক্ষা করতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশিত ভিন্ন ভিন্ন প্রটোকল প্রয়োজন হয়। যে এলাকায় কীটনাশক দেওয়া হচ্ছে সেই এলাকা থেকে মশার লার্ভা নিয়ে রেয়ারিং কলোনীতে রাখতে হয়। পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে ৩-৫ দিন বয়স্ক স্ত্রী মশা যেটি এখনো রক্তপান করে নি এইরকমের মশা পরীক্ষার জন্য ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।[২৯] কিন্তু রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) এক্ষেত্রে ঢাকার বাইরে থেকে কীটনাশক প্রতিরোধী ক্ষমতা তৈরি হয়নি এমন মশা নিয়ে এসে পরীক্ষা করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশিত ল্যাব সাপোর্ট, মশার রেয়ারিং কলোনি না রেখেই আইইডিসিআর মশারির মধ্যে ফগিং করে দেখে যে মশা এই ওষুধে মরে কিনা। এছাড়া কীটনাশকের কার্যকরতা পরীক্ষার ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতিও সংঘটিত হয়ে থাকে, যেমন নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে কার্যকরতার সনদ প্রদান, ক্ষেত্র বিশেষে পরীক্ষা না করেই প্রতিবেদন দেওয়া ইত্যাদি। কোনো কীটতত্ত্ববিদ ছাড়াই আইইডিসিআর-এর কীটতত্ত্ব বিভাগের কার্যক্রম পরিচালান হচ্ছে। এখানে চিকিৎসক দিয়ে কীটনাশকের কার্যকারতা পরীক্ষা করানো হয়। দুই সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পাঠানো একই প্রতিষ্ঠানের সরবরাহকৃত একই কীটনাশক আইইডিসিআর-এর পরীক্ষায় একবার কার্যকর আরেকবার অকার্যকর বলা হয়েছে।

২.৬.৩ কীটনাশকের নিবন্ধনে অনিয়ম ও দুর্নীতি

যে কোনো ব্যক্তিকে কীটনাশক আমদানি, উৎপাদন, পুনরুৎপাদন, মোড়কজাতকরণের জন্য 'বালাইনাশক আইন ২০১৮ (ধারা ৪)' অনুযায়ী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং-এর অধীনে উক্ত পণ্যের জন্য নিবন্ধন ও লাইসেন্স নিতে হয়। এই নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে থাকে। জনস্বাস্থ্য কীটনাশকের নিবন্ধন পাওয়া কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান কীটনাশকের একচেটিয়া উৎপাদন ও বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধা পেতে উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর কর্মকর্তাদের একাংশকে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের মাধ্যমে নতুন প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন প্রক্রিয়া বন্ধ করে রাখে। এছাড়া উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর কীটনাশকের নিবন্ধন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে অনিয়ম-দুর্নীতি করলেও এ বিষয়ে কোনো জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হয় না।

> "একটি কীটনাশকের নিবন্ধন নিতে হলে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ২-৩ লাখ টাকা খরচ করতে হয়, তাও সবাইকে দেয়া হয় না, এর জন্য তদবিরও করতে হয়।"
>
> *- একটি বেসরকারি কীটনাশক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের মালিক*

> "এখানে নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু করার সময় শুধু কথা বলতেই ৫ হাজার টাকা দিতে হয়, এরপর প্রতি ধাপেই টাকা দিতে হয়, আর একটি পণ্যের নিবন্ধন নিতে ২ বছরেরও বেশি সময় লাগে, ফলে আমি নিবন্ধনের আবেদন প্রত্যাহার করে নিয়েছি।"
>
> *- অপর একটি বেসরকারি কীটনাশক ব্যবসায়ি প্রতিষ্ঠানের মালিক*

[২৯] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, Monitoring and managing insecticide resistance in Aedesmosquito populations: Interim guidance for entomologists, বিস্তারিত দেখুন: https://apps.who.int/iris/handle/10665/204588

যদিও বলা হয় একটি পণ্য নিবন্ধন দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো পন্যর আবেদন যাচাই করার জন্য পেস্টিসাইড টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজরি কমিটি (পিটাক) ও সাব-পিটাক-এর যে সভাগুলো হওয়ার কথা তা যথাক্রমে ছয়মাস ও তিনমাস পরপর হওয়ার কারণে এই বিলম্ব হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে অভিযোগ আছে যে অর্থ না দিলে কোনো কীটনাশকের নিবন্ধনের আবেদনপত্র উক্ত কমিটির আলোচনা সভায় উত্থাপন করা হয় না।

২.৭ মাঠ পর্যায়ের মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

২.৭.১ অপ্রয়োজনীয় ও লোক দেখানো ব্যবস্থা গ্রহণ

এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে দুই সিটি কর্পোরেশনের কিছু অপ্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে, যেগুলো কার্যকর ছিল না। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-

- **হোল্ডিং করদাতাদের জন্য অ্যারোসল ক্রয়:** হোল্ডিং করদাতাদের বিনামূল্যে অ্যারোসল প্রদানের জন্য ২ লক্ষ অ্যারোসোল ক্রয় করা হয়, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, হোল্ডিং করদাতারা সিটি কর্পোরেশনে গিয়ে অ্যারোসল নিয়ে আসবে। প্রথমত যারা হোল্ডিং করদাতা তাদের অ্যারোসল ক্রয় করার সামর্থ্য আছে এবং দ্বিতীয়ত, তারা রিক্সাভাড়া ও সিএনজি ভাড়া খরচ করে একটি অ্যারোসল আনতে সিটি কর্পোরেশনে যাবে না। কিন্তু যাদের অ্যারোসল ক্রয়ের সামর্থ্য নেই তাদের কথা বিবেচনা করা হয় নাই।
- **মশার প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংসে 'স্টপ ডেঙ্গু' মাবাইল অ্যাপ তৈরি:** এই অ্যাপে এডিস মশার প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস করার জন্য প্রজনন ক্ষেত্রের ছবি তুলে আপলোড করা ছাড়া আর কোনো ফিচার যুক্ত করা হয় নাই। এবং ছবি আপলোড করার পর এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ/ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। ডেঙ্গু রোগ ও এডিস মশা বিষয়ক কোনো তথ্য এখানে নেই। ছবি আপলোড করার ক্ষেত্রেও কারিগরি ত্রুটি রয়েছে।
- এছাড়া গণমাধ্যমে প্রচারের জন্য লোক দেখানো বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, যেমন, পরিষ্কার সড়কে 'বর্জ্য পরিষ্কার' করা এবং ফগিং করা ইত্যাদি।

২.৭.২ মাঠ পর্যায়ের মশা নিধন কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতি

মশা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে অ্যাডাল্টিসাইড প্রয়োগের জন্য যে কীটনাশক ও ফগার মেশিনের জ্বালানি সরবরাহ করা হয়, মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের একাংশ তা যথাযথভাবে ব্যবহার না করে বাজারে বিক্রি করে দেয়। এছাড়া লার্ভিসাইডের জন্য যে কীটনাশক সরবরাহ করা হয় তা ব্যবহার না করে কোনো কোনো কর্মী কীটনাশক ফেলে দেয়। সাধারণত প্রধান সড়ক ধরে ফগিং করা হয়, তখন একটু ভিতরের দিকের বাড়ি বা বাড়ির নিচতলায় বা গ্যারেজে ফগিং করানোর জন্য কর্মীদের ৫০-২০০ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে হয়। এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে জনসম্পৃক্ততা প্রয়োজন, কিন্তু দুই সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে জন অংশগ্রহণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নি।

২.৭.৩ দায়িত্ব পালনে অবহেলা

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেন যে ঈদযাত্রার কারণে এডিস মশা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়বে। ডেঙ্গু রোগ যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তা প্রতিরোধে ঈদযাত্রায় প্রতিটি বাস ছাড়ার আগে মশা নাশক অ্যারোসল স্প্রে করার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে বাসমালিকদের চিঠি দেওয়া হয়। কিন্তু এই কার্যক্রমও বাস্তবায়ন করা হয় নি। ফলে এই সময়ে ডেঙ্গু ঢাকার বাইরে ৬৪টি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। একইভাবে ট্রেইন ও লঞ্চেও এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি।

দুই সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ডের সব এলাকায় সমানভাবে মশা নিয়ন্ত্রণের কাজ করা হয় না। নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে নিয়মিতভাবে ফগিং করা হয় না। এছাড়া ডেঙ্গু মৌসুম শেষ না হতেই কোনো কোনো এলাকায় মশা নিধন কার্যক্রম শিথিল হয়ে যাওয়ার বিষয়টি লক্ষ করা যায়।

২.৭.৪ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা: জনবল ঘাটতি ও প্রশিক্ষণের অভাব

ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মী বণ্টনের ক্ষেত্রে উক্ত ওয়ার্ডের আয়তন বিবেচনা করা হয় না। যেমন দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের একটি ওয়ার্ডের আয়তন ০.৬১৮ ব.কি. এবং সেখানে ৭ জন মশক নিধন কর্মী আছে, পক্ষান্তরে একটি ওয়ার্ডের আয়তন ১.৯২৭ ব.কি. হলেও সেখানকার কর্মী সংখ্যা ৬ জন। একইভাবে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের একটি ওয়ার্ডের আয়তন ১.৯৪৬ ব.কি. এবং সেখানে ৯ জন কর্মী আবার একটি ওয়ার্ডের আয়তন ৩.৬৬১ ব.কি. হলেও সেখানে ৫ জন কর্মী আছে। সার্বিকভাবে দুই সিটি কর্পোরেশনে গড়ে ওয়ার্ডপ্রতি ৫ জন মশক নিধন কর্মী রয়েছে, যা মশা নিধন বিশেষত এডিস মশার উৎস নির্মূলের জন্য অপ্রতুল। উল্লেখ্য, কলকাতা পৌরসংস্থায় প্রতি ওয়ার্ডের জন্য গড়ে ১৫ জন কর্মী রয়েছে। এছাড়া ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের প্রতি চার ওয়ার্ডের জন্য গড়ে মাত্র একজন তত্ত্বাবধায়ক বা মশক

সুপারভাইজার রয়েছে। ফলে মশার কীটনাশক দেয়ার কাজ যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করার কার্যক্রম খুবই দুর্বল। এছাড়া মশক নিধন কর্মীদের বিশেষত অস্থায়ীভাবে দিনচুক্তিতে বা আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত কর্মীদের মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে।

কেস ১: সিঙ্গাপুর এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম[৩০]

সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল এনভায়রেমেন্ট এজেন্সির (এনইএ) কর্মীরা নিয়মিতভাবে মানুষের ঘরে ঘরে এবং এলাকায় গিয়ে জনসমাগম, নির্মাণ এলাকা, এবং হাউজিং এস্টেটে ডেঙ্গু মশার প্রজননস্থল খুঁজে ধ্বংস করে থাকে। এভাবে ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ২ লক্ষ ২৪ হাজার পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে যার মধ্যে ১ হাজার ৮০০ অভিযান চালানো হয়েছে নির্মাণ এলাকায়। এর মাধ্যমেম ২ হাজার ৯০০ এডিস মশার প্রজনন স্থল খুঁজে বের করে ধ্বংস করা হয়েছে। ২০১৮ সালে এনইএ মোট ১০ লক্ষ পরিদর্শন কার্যক্রম চালিয়েছে যার মধ্যে ৯ হাজারটি ছিল নির্মাণ এলাকা। এর মাধ্যমে সে বছর মশার প্রায় ১৮ হাজার প্রজননস্থল ধ্বংস করা হয়।

সিঙ্গাপুরের আইন অনুসারে নির্মাণ কাজের সময় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে পেস্ট কন্ট্রোল অফিসার ও পরিচ্ছন্ন কর্মী নিয়োগ দিতে হয়। যাদের কাজ হলো প্রতিদিন সকালে মেঝে পরিষ্কার করা এবং দুই সপ্তাতে একবার মশকরোধী তেল প্রয়োগ করা, যেন এসব সাইটে জমে থাকা পানিতে মশা জন্মাতে না পারে। এনইএ প্রতি মাসে অন্তত একবার নির্মাণ এলাকাগুলো পরিদর্শন করে, আইন ভঙ্গ করলে জরিমানা করা হয়, এমনকি সাময়িক ভাবে কাজ বন্ধ করেও দেয়া হয়। ২০১৮ সালে ৪০টি নির্মাণকাজ বন্ধ করার আদেশ প্রদান করা হয়। এভাবে নিয়মিত নজরদারির ফলে ২০১৩ সালে যেখানে ১১ শতাংশ নির্মাণ এলাকায় এডিস মশার লার্ভা পাওয়া গিয়েছিলে, সেখানে ২০১৯ সালে তা মাত্র ৪ শতাংশে নেমে আসে।

এনইএ'র নিজস্ব কর্মীর পাশাপাশি এডিস প্রতিরোধ স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমেও আবাসিক এলাকায় পরিদর্শন কার্যক্রম চালানো হয়। এনইএ এরকম ৮ হাজার ৫০০ ভলান্টিয়ার বা স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দিয়েছে যারা এলাকায় এলাকায় মানুষকে সচেতন করার কাজ করে। ডেঙ্গু মশার বৃদ্ধির উপর নজর রাখার জন্য এনইএ গোটা সিঙ্গাপুর জুড়ে ৫০ হাজার গ্রেভিট্র্যাপ (Gravitrap- ডিমপাড়তে ইচ্ছুক স্ত্রী এডিসমশা আটকানোর বিশেষ ফাঁদ) স্থাপন করেছে। এই ফাঁদে আটকানো মশার তথ্য থেকে এনইএ ধারণা করতে পারে কোন কোন এলাকায় এডিশ মশার প্রাদুর্ভাব বেশি হচ্ছে, ফলে সীমিত সংখ্যক লোকবল দিয়ে কোথায় কোথায় অভিযান পরিচালনা করলে সবচেয়ে কার্যকর ফলাফল পাওয়া যাবে। তাছাড়া এই ফাঁদের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক প্রাপ্তবয়স্ক এডিস মশা মারা সম্ভব হয়। এই গ্রেভিট্র্যাপ নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে এনইএ ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ২১ শতাংশ বেশি মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করতে সক্ষম হয়।

২.৭.৫ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা: অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি ঘাটতি

২০১৮ সালের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় ঢাকা উত্তর সিটির ৬৫২টি মেশিনের মধ্যে অর্ধেক মেশিন নষ্ট ছিল। বর্তমান অর্থবছরে উত্তর সিটি কর্পোরেশন জরুরি পরিস্থিতিতে নতুন কিছু মেশিন ক্রয় ও কিছু মেশিন মেরামত করলেও এখনো ৪০-৪৫টি মেশিন নষ্ট। পক্ষান্তরে উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৯৪০টি মেশিনের মধ্যে ৪২৮টি মেশিন নষ্ট ছিল (হ্যান্ডেলড মেশিন ৪৪২টির মধ্যে ২০৮টি, ফগার মেশিন ৪৪৭টির মধ্যে ২০২টি এবং হুইলব্যারো ৫১টির মধ্যে ১৮টি নষ্ট)।[৩১] অধিকাংশ নষ্ট মেশিনের যন্ত্রাংশ বাংলাদেশে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ নষ্ট মেশিনের কারণে মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম দীর্ঘদিন সীমিত পর্যায়ে ছিল। এছাড়া যন্ত্রপাতির অভাবে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নতুন যুক্ত হওয়া ওয়ার্ডগুলোর কিছু কিছু এলাকা এখনো মশা নিধন কার্যক্রম নিয়মিত হচ্ছে না। যেমন, একটি এলাকায় কর্মী সংখ্যা ১০ জন কিন্তু মেশিন আছে ৩টি।

[৩০] বিস্তারিত দেখুন: https://www.nea.gov.sg/media/news/news/index/nea-urges-continued-vigilance-in-fight-against-dengue-2019

[৩১] ঢাকা ট্রিবিউন, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, বিস্তারিত দেখুন: http://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2018/02/25/city-corporations-failing-tackle-mosquito-problem/

কেস ২: কলকাতা পৌরসংস্থানের এডিস নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

২০১৮ সালে পৌরসংস্থার অধীনে ১৫টি ডেঙ্গু ডিটেকশন সেন্টার তৈরি করা হয়েছে, যেখানে ২০১৮ সালে প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ বিনামূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষা করিয়েছে। ১৪৪টি ওয়ার্ডে ৯৩০টি মশা নিয়ন্ত্রণ দল তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি দলে দুইজন করে কর্মী থাকে। একজন মশা নিয়ন্ত্রণের কাজ করে এবং একজন মানুষকে এডিস মশা বিষয়ে সতর্ক করে থাকে। তারা প্রতিদিন মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে স্টেট হেলথ ডিপার্টমেন্টে অনলাইনে এই সকল তথ্য প্রেরণ করে। এডিস নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১৬টি র‍্যাপিড একশন টিম এবং ১৬টি বোরোতে একটি করে মোট ১৬টি বোরো র‍্যাপিড একশন টিম রয়েছে, যার প্রতিটিতে ৮-১০ জন করে কর্মী রয়েছে। নিজ নিজ কর্মএলাকার মশা নিয়ন্ত্রণে নিয়মিতভাবে আন্ত মন্ত্রণালয় ও আন্ত বিভাগীয় সভা পরিচালনা করা। নৌকার মাধ্যমে লার্ভিসাইডিং করা। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিফলেট, ব্যানার, টিভি বিজ্ঞাপন ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে। সহজে পৌছানো যায় না এমন এলাকায় এডিস মশার প্রজননস্থল চিহ্নিত করতে ড্রোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২.৮ মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বয়

সারা দেশব্যাপী সমন্বিত পরিকল্পনা ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, আইইডিসিআর, সিটি কর্পোরেশনসমূহ, স্থানীয় সরকার, রাজউকসহ অন্যান্য বিভাগীয় উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ওয়াসা, রিহ্যাব, পরিবেশ অধিদপ্তর, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, আবহাওয়া অধিদপ্তর ইত্যাদি দপ্তরগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোসহ কিছু বিষয়ে সমন্বয় প্রয়োজন রয়েছে-

- এডিস মশার প্রজননস্থল নির্মূলে নির্মাধীন ভবন ও বড় বড় নির্মাণ প্রকল্প এলাকা তদারকি ও তাদের আইনের আওতায় আনা;
- বাস টার্মিনাল, রেলস্টেশন ইত্যাদি এলাকা তদারকি ও এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করা;
- আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের পূর্বাভাস দেওয়া;
- এডিস মশা জরিপ; প্রাদুর্ভাবের সাথে সাথে ডেঙ্গু আক্রান্তের এলাকা (হটস্পট) চিহ্নিত করা; তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ
- জলাবদ্ধতা নিরসণ ও এডিস মশার উৎস নির্মূলের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

কিন্তু এ সকল বিষয়ে উল্লিখিত দপ্তরগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এছাড়া সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও স্বাস্থ্য বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। ২০১৯ থেকে ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের পর থেকে মশার উৎস নির্মূলে মশক নিধন কর্মীদের সাথে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মীরা কাজ করছে। এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও নিধনের ক্ষেত্রে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের নেতৃত্ব পর্যায়ের ব্যক্তিগণ কখনোই সমিন্বতভাবে পরিকল্পনা করে নি এবং সমন্বিতভাবে মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয় নি। ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ও হটস্পট চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন, সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি বিদ্যমান। অন্যদিকে যাদের ওপর মশা নিয়ন্ত্রণের মূল দায়িত্ব ছিল তাদের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি ও অবহেলার কারণে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ার পর সাধারণ জনগণের ওপর দায় চাপিয়ে জরিমানা শুরু করে।

২.৯ পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণের সুযোগের ঘাটতি

কীটতত্ত্ববিদসহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের শুধুমাত্র জরুরি পরিস্থিতিতে মতামতের জন্য ডাকা হয়। কিন্তু জরুরি পরিস্থিতি ছাড়া অন্য সময়ে মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয় না। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে জরুরি পরিস্থিতিতে যে কমিটিগুলো করা হয়ে থাকে তা পরবর্তীতে কার্যকর থাকে না। বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করা বিশেষজ্ঞদের মতামত পছন্দ না হলে তাদের পরবর্তীতে আর ডাকা হয় না। সিটি কর্পোরেশনগুলো কীটনাশকের মান পরীক্ষা করার জন্য উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং-কে নিয়মিত ডাকে না; তবে তাদের যখন ডাকা হয় তখন তারা যান।

চিত্র ৩: মশা নিয়ন্ত্রণে সুশাসনের ঘাটতি ও ফলাফল

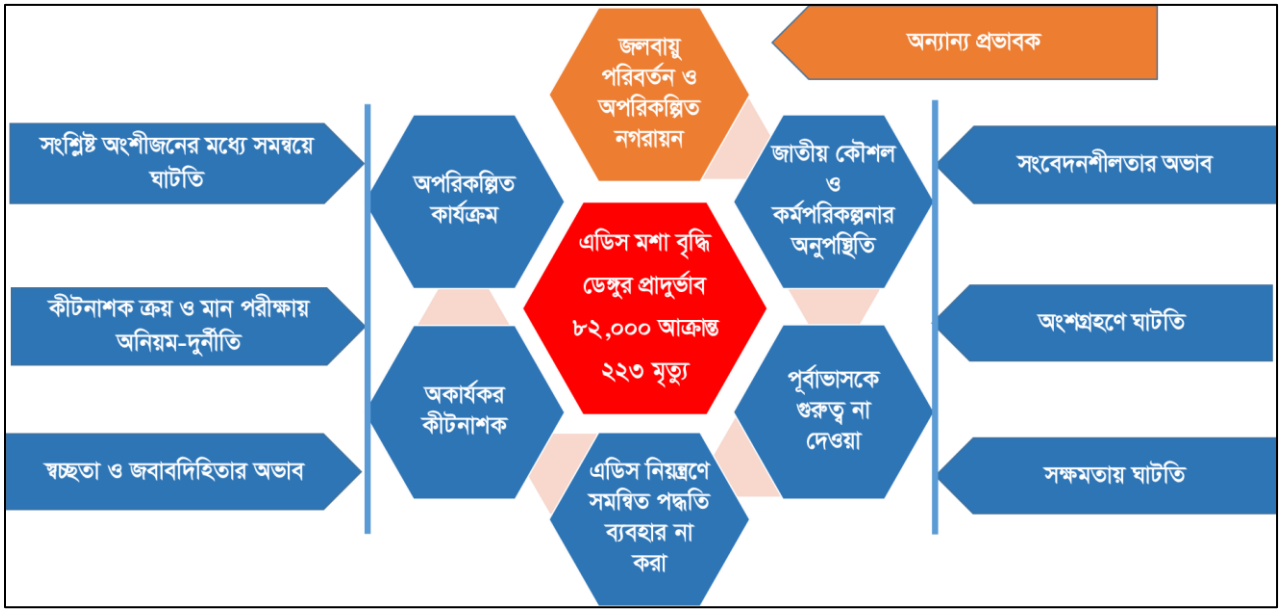

২.১০ মশা নিয়ন্ত্রণে সুশাসনের ঘাটতি ও ফলাফল

বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব হলেও ২০১৯ সালে ডেঙ্গু রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাবের কারণ হিসেবে যেসব বিষয় সামনে আসে তার মধ্যে রয়েছে: জলবায়ু পরিবর্তন, অপরিকল্পিত নগরায়ন, এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে জাতীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা না থাকা, এডিস মশা জরিপের পূর্বাভাস অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সমন্বিত পদ্ধতিগুলো গ্রহণ গ্রহণ না করা, অকার্যকর কীটনাশক ব্যবহার, এবং মশা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অপরিকল্পিত ও অকার্যকর কার্যক্রম গ্রহণ করা।

এর ফলে এ বছর বাংলাদেশে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব প্রায় মহামারী পর্যায়ে চলে যায়, ডেঙ্গু মশা ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে পরে, লক্ষাধিক মানুষ আক্রান্ত হয় এবং বেসরকারি হিসেবে ২২৩ জনের মৃত্যু হয়। এক্ষেত্রে মানুষের রোগের বোঝা বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষেত্রে সুশাসনের যেসব ঘাটতি এই গবেষণায় উঠে আসে তার মধ্যে রয়েছে - সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয়ে ও অংশগ্রহণের ঘাটতি, দীর্ঘদিন ধরে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব হলেও কৌশল প্রণয়নে গুরুত্ব না দেয়া অর্থে সংবেদনশীলতায় ঘাটতি, এডিস মশা জরিপের পূর্বাভাস ও ডেঙ্গুর ব্যাপক প্রাদুর্ভাবে যথাযথ সাড়া প্রদান না করা, এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সক্ষমতার ঘাটতি, এবং কীটনাশক ক্রয়ে ও এর মান পরীক্ষায় অনিয়ম-দুর্নীতি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি (চিত্র ৩)।

অধ্যায় তিন
উপসংহার

৩.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছর ধরে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব থাকলেও জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ডেঙ্গু মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। এক্ষেত্রে যে জাতীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা করার কথা তা খুব প্রাথমিক অবস্থায় আছে। ঢাকা শহরের এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি না রেখে দুই সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম শুধু রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা-কেন্দ্রিক ও অ্যাডাল্টিসাইড পদ্ধতি-নির্ভর যা এডিস মশার ক্ষেত্রে কার্যকর নয়। এই কীটনাশক নির্ভর মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে ক্রয়ের সুযোগ বেশি থাকার ফলে দুর্নীতির ক্ষেত্র তৈরি হয়, যা উপযুক্ত ও কার্যকর অ্যাডাল্টিসাইড নির্ধারণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। অনিয়ম-দুর্নীতির উদ্দেশ্যে কীটনাশক ক্রয়ে যথাযথভাবে সরকারি ক্রয় আইন অনুসরণ না করার ফলে সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে, নির্ধারিত বাজেটের পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না এবং মানহীন কীটনাশক সরবরাহ করা হচ্ছে। মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত এই আংশিক পদ্ধতিটিও অকার্যকর হওয়ার ফলে সার্বিক মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম অকার্যকর হয়ে যায়। এছাড়া ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের প্রকৃত চিত্র চিহ্নিত, এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতির ফলে যথাসময়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। বিক্ষিপ্তভাবে লোক দেখানো অকার্যকর কার্যক্রম গ্রহণ এবং সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে সারা দেশে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে যা লক্ষাধিক মানুষের ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়া এবং দুই শতাধিক মানুষের মৃত্যুর কারণ।

৩.২ সুপারিশ

এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ ও এই কার্যক্রম সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ফলাফলের আলোকে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো-

ক. কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে সকল অংশীজনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্ট করতে হবে।

২. জাতীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে মশা নিধনে নিজস্ব পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সকল প্রকার পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিত করে সিটি কর্পোরেশনগুলোকে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; পরিবেশবান্ধব পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে (যেমন, এডিস মশার উৎস নির্মূল, পরিবেশবান্ধব রাসায়নিক ব্যবহার); বছরব্যাপী এ কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ. আইনি সংস্কার

৪. এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে নির্মাণাধীন ভবন, নির্মাণ প্রকল্প ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (রিহ্যাব, হাউজিং এস্টেট কোম্পানি ইত্যাদি) দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হবে তা সংশ্লিষ্ট আইনগুলোতে স্পষ্ট করতে হবে। দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান থাকতে হবে।

গ. এডিস মশা জরিপ, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ, ডেঙ্গুর আগাম সতর্কতা

৫. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে সকল সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল ও রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রকে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের অধীনে নিয়ে আসতে হবে, যেখানে সকলের প্রবেশের সুযোগ থাকবে; ডেঙ্গু রোগী চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে সিটি কর্পোরেশন এবং দেশের অন্য এলাকায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

৬. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, আইইডিসিআর ইত্যাদি দপ্তরের সহযোগিতা নিয়ে প্রতিবছর ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই সিটি কর্পোরেশনগুলো সব হটস্পট চিহ্নিত করবে এবং এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা করবে।

৭. এডিস মশার জরিপ কার্যক্রম ঢাকার বাইরে সম্প্রসারিত করতে হবে; এক্ষেত্রে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কীটতত্ত্ববিদ, বেসরকারি গবেষণা সংস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

ঘ. জনবল ও প্রশিক্ষণ

৮. জনসংখ্যা, আয়তন, ডেঙ্গু আক্রান্তের হার, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ইত্যাদি বিবেচনা করে মাঠ পর্যায়ের জনবলের চাহিদা নিরূপণ ও এবং চাহিদার ভিত্তিতে নিয়োগ, আউট সোর্সিং বা জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করতে হবে; এর জন্য পর্যাপ্ত ও সুষম বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

৯. মশা নিধন কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক দলকে এডিস মশা নির্মূলের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ. মশক নিধন কীটনাশক ও উপকরণ ক্রয়

১০. উপযুক্ত কীটনাশক ও এর চাহিদা নির্ধারণ, ক্রয়, কার্যকরতা ও সহনশীলতা পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বিশেষজ্ঞ কারিগরি কমিটি করতে হবে; তাদের কার্যক্রম নিয়মিত হতে হবে এবং সভাগুলোর কার্যবিবরণী প্রকাশ করতে হবে।

১১. অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে কীটনাশক ক্রয় প্রক্রিয়ায় জাতীয় ক্রয় আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করতে হবে।

১২. মশা নিধন কার্যক্রম-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম-দুর্নীতি ও দায়িত্বে অবহেলার বিষয়গুলো তদন্ত করে সংশ্লিষ্টদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

চ. কীটনাশকের মান ও কীটনাশক প্রতিরোধী ক্ষমতা পরীক্ষা

১৩. মশার কীটনাশক প্রতিরোধী ক্ষমতা রোধ করার জন্য কিছুদিন পরপর যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কীটনাশক পরিবর্তন, একেক এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন কীটনাশক ব্যবহার ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. তৃতীয় পক্ষ (বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কীটতত্ত্ববিদ, বেসরকারি গবেষণা সংস্থা ইত্যাদি) কর্তৃক মশার কীটনাশক প্রতিরোধী ক্ষমতা এবং মশা নিধন কার্যক্রম মনিটরিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫. আইইডিসিআর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের কীটতত্ত্ববিদসহ বিশেষজ্ঞ শূন্যপদগুলো পূরণ করতে হবে এবং পদ না থাকলে পদ সৃষ্টি করতে হবে।

****